



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 154 - 158

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প, 'হিঙের কচুরি' : স্নেহ- ভালোবাসা-সহানুভূতির এক ত্রিবেণী সঙ্গম

ড. গৌতম সন্বিগ্রাহী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মহিষাদল গার্লস কলেজ, পূর্ব মেদিনীপুর

Email ID: gsanbigrahi@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Hinger Kochuri,
Humanity, love,
short story,
Affection,
Kusum,
Prostitute,
Babu.

Abstract

Bibhutibhusan is a brilliant writer in the genre of Bengali fiction. In his fiction, we have seen people who are known but remains invisible to us until now. In his novels or short stories he usually made focus on the most ordinary issues of society. The characters he created are very ordinary, insignificant. He filled the neglected, deprived, simple people with wonderful compassion and love. In the article 'Hinger Kochuri', one of Bibhutibhusan's short stories, has aptly reflected that idea. At the centre of the story is a prostitute. Her name is Kusum. When the story teller meet's Kusum he is at the age of eight. The story teller meets Kusum near his rented house which was the house of Iswar Napit in Nandaram Street, Kolkata. For his father's profession they live there and spent his childhood. The story teller's childhood love and affection is described through the name of a food item 'Hinger Kochuri'. In this situation, Kusum gradually develops a friendship with the boy mainly for the sake of eating the 'Hinger Kochuri', brought from the so-called babu's shop. Gradually Kusum's affection for the boy elevates to motherhood. His mother forbids him from going to their house. Even Kusum shows maternal affection towards the boy from eating anything else except the 'good food' given by the Babu who comes to her. In his way, due to the change of profession of the story teller's father they have to leave their home in Kolkata and go to their village home. Here kusum's affection, love and memory for the boy takes a long break. Then they meet after a long thirty years. In the course of events, the storyteller grows up and comes to Kolkata for work. He meets old Kusum. Exchanging greetings, Kusum brings 'Hinger Kochuri' in a leafy thonga from some where to eat. After eating 'Hinger Kochuri' the story teller returns to his childhood memories where he finds natural love and affection of a mother. In the story Bibhutibhusan has highlighted the humanity, affection, love and generous hearts of the low-class prostitutes of the society. They are also human being. Profession or livelihood is not great love and humanity remains above all.

Discussion

বাংলা কথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের রচনা কর্মে হয়তো জীবন সমাজচেতনার নানা বৈচিত্র্যের ডালি আমাদের উপহার দিয়েছেন। সেদিক থেকে বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাসে কিংবা ছোটগল্পে জীবন সমাজচেতনার জটিলতায় না গিয়ে সহজ সরল মানবিক আবেদন, প্রকৃতির অসামান্য অথচ সাধারণ তুচ্ছাতুচ্ছ রূপকে যে নিপুণ মমতায় অঙ্কিত করেছেন তা বাংলা কথাসাহিত্যে বিরল। প্রকৃতির যে রূপ আমরা এর আগে দেখেও বুঝনি তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। সহজ সরল জীবনের ছবি, মানবিকতা ভালোবাসার অকৃত্রিম অনুভূতি আমরা তেমনভাবে সম্পৃক্ত হতে পারি নি বিভূতিভূষণ আমাদের সম্পৃক্ত করালেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উত্তর সামাজিক দূষণ, জীবনের সংকট, বৃটিশদের ধারাবাহিক অনাচার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে যার ধারাবাহিকতা বিদ্যমান সেই অসহনীয় পরিবেশে গ্রাম বাংলার সহজ সরল রূপকে, মানুষকে অনাড়ম্বর ভাবে পরিবেশন করে গেছেন কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ। যান্ত্রিক জীবন জটিলতার বাইরেও যে এক সুন্দর পৃথিবী রয়েছে তারই সঙ্গে আমাদের যেন তিনি নতুন করে পরিচয় করে দিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা বিভূতিভূষণের একটি ছোটগল্প ‘হিঙের কচুরি’কে নির্বাচন করেছি যেখানে সেই সহজ সরল মানবিকতা স্নেহ-ভালোবাসা-সহানুভূতির ত্রিবেণী সঙ্গম কিভাবে মিলিত হয়েছে সেই যান্ত্রিক জটিলতা সর্বস্ব জীবনে তা তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

‘হিঙের কচুরি’ ছোটগল্পটির নামকরণে আমরা শুধুমাত্র একটি খাদ্যবস্তুর পরিচয় দেখব না। বিভূতিভূষণ এই খাদ্যবস্তুটিকে সামনে রেখে কীভাবে স্নেহ-ভালোবাসা-মানবিকতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন আমরা সেই দিকটি পর্যালোচনা করবো। গ্রাম শহরের অগণিত অতি সাধারণ নারী ও পুরুষের যে জীবনচিত্র তিনি এঁকেছেন প্রায় তাঁর বেশীরভাগ চরিত্র লেখকের নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা। তাই শুধু গ্রামীণ জীবন পরিবেশের ছবি নয় শহুরে বা নগরজীবন পরিবেশেও সাধারণ অবহেলিত মানুষদের ছবি তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে যায় নি। আমরা তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পে সেই ছবি পাব। ‘হিঙের কচুরি’ ও সেই রকম একটি ছোটগল্প যেখানে এক বারবণিতা ‘কুসুম’কে নিয়ে পুরো ঘটনাক্রম আবর্তিত হয়েছে। গল্প কথকের কথায় কলিকাতায় নন্দরাম সেনের গলিতে আটবছর বয়সের সময় তার বাবা ঈশ্বর নাপিতের বাড়িতে ভাড়া নিয়েছিলেন কাজের সুবাদে। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা না থাকায় অনেক পরিবারের মধ্যে থাকতে হয়েছিল। গল্পকারের কথায়—

“কলকাতার এ বাড়িতে জায়গা বড় কম, লোকের ভিড় বেশি।”^১

এরকম একটি শহুরে পরিবেশে গ্রাম থেকে আসা গল্পকথক তাঁর বাবার কাজের সূত্রে বসবাস শুরু করে। গল্পকার এরপর তাদেরই বাসাবাড়ি থেকে কিছুটা দূরে কতকগুলো সারবন্দী খোলার বাড়িতে থাকা গল্পের মুখ্য চরিত্রের বসবাসের চিত্র তুলে ধরে—

“তাদের বাড়িঘর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কত কি জিনিসপত্র— আয়না, পুতুল, কাঁচের বাস, দেওয়ালে কেমন সব ছবি টাঙানো। এক এক ঘরে একজন মেয়ে মানুষ থাকে। আমি তাদের সকলের ঘরে যাই, বিকেলের দিকে যাই, সকালেও মাঝে মাঝে যাই। ওই বাড়িগুলোর মধ্যে একটি মেয়ে আছে, তার নাম কুসুম। সে আমাক খুব ভালোবাসে, আমিও তাকে ভালোবাসি। কুসুমের ঘরেই আমি বেশিক্ষণ সময় থাকি। কুসুম আমার সঙ্গে গল্প করে, আমাদের দেশের কথা জিজ্ঞেস করে।”^২

গল্প কথকের বাল্য বয়সের ‘কুসুম’ নামী নারী চরিত্রের এই স্মৃতি তার পেশাগত ক্ষেত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল এটা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না।

আসলে কুসুম এই গল্পের একজন বারবণিতা। তার রূপসৌন্দর্য রয়েছে। শুধু কুসুম নয়, ঐ সারবন্দী খোলার বাড়িগুলির স্বতন্ত্র কুঠুরিতে আরও অনেক বারবণিতা থাকত। বিকেলের দিকে এরা প্রত্যেকে সাজগোজ করত, কপালে টিপ পরত, ময়দার মতো গুঁড়ো মুখে মেখে তথাকথিত ‘বাবু’দের মনোরঞ্জন করত। এ সময় বালক গল্প কথককে ঘরে থাকতে দিত না। বাড়ি পাঠিয়ে দিত। কারণ তখন তাদের ঘরে ‘বাবু’ আসবে। এরকম পরিস্থিতিতে একদিন তারা কৌতূহলবশত তথাকথিত বাবুর সঙ্গে ‘হিঙের কচুরি’ খাদ্যের আশ্বাদ সে পায়। গ্রাম্য দরিদ্র বালকের কাছে তা অমৃতসম মনে হয়। ঘটনা পরম্পরায় সেই বাবুর কাছ থেকে খাস্তা গজা, অমৃতি, জিলিপি প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্যবস্তু খাওয়ার বাসনায় কুসুম-এর ঘরে

যাতায়াত উত্তরোত্তরভাবে বাড়তে থাকে। বালকের রসনাতৃষ্ণির কথা ধীরে ধীরে তার মা জানতে পারে। মা বারণ করে তাকে কুসুমের ঘরে যেতে। সে বুঝতে পারে না কেন তার মা কুসুমের ঘর যেতে বারণ করে। ব্রাহ্মণ বালক হওয়ার সুবাদে কুসুমের তাক জল খেতে না দেওয়ার বিষয়টিও গল্পকার সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন—

“এখানে তোমাকে জল দেব না। রাস্তার কল থেকে জল খেয়ে যেও। বামুনের ছেলেকে হাতে করে জল দিতে পারব নি। এই জন্মের এই শাস্তি।”^৩

আসলে পতিতাবৃত্তিকে সমাজে যে নীচ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হয় এই দিকটিকেই এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

কুসুমেরই সমগোত্রীয় পতিতা মাখন, প্রভা প্রমুখ নারীদের দেওয়া খাদ্যবস্তু থেকে সর্বদা বালক গল্পকথককে বিরত রাখার চেষ্টা করে কুসুম। প্রভার চালতে অঞ্চল দিয়ে ভাত খেতে বসলে কুসুমের দৃষ্টিতে তা পণ্ড হয়। এইভাবে কুলচুর খাওয়াও পণ্ড হয়। সর্দিকাশির জন্য কুসুম তাকে বারণ করে—

“আমার মনে ভয়ানক দুঃখ হল। কুসুম খেতে দিল না কুলচুর। কখন হল আমার সর্দিকাশি? কুলচুর আমি কত ভালোবাসি।”^৪

অন্য একটি ঘরের বাসিন্দা সুজি খেতে দিতে দিলে তাকেও পেটের অসুখের দোহাই দিয়ে বালকটিকে কুসুম খেতে দিলে না—

“তুমি ছেলেমানুষ কি বোঝ? কার মধ্যে কি খারাপ রোগ আছে পাড়ায়। তোমায় আমি যার তার হাতে খেতে দেব? যার তার জিনিস মুখে করলেই হল। তোমার কি? কার মধ্যে রোগ আছে তুমি তা জান?”^৫

এইভাবে গল্পে কুসুম ভাতুস্নেহে আগলে রাখে বালকটিকে। নিষ্পাপ সরল ভোজনপ্রিয় বালকটি তাদের পেশাগত রোগব্যাধির আক্রমণের শিকার যাতে না হয়ে পড়ে তার জন্য দিদির মতো স্নেহ ভালোবাসায় সর্বদা অতন্দ্র প্রহরীর মতো তাকে রক্ষা করতে সচেষ্ট থেকেছে কুসুম। এরপর গল্পকথক রূপী বালকটি জুরে শয়্যাগত হয়ে চার পাঁচদিন থাকে। কুসুমের বাড়ি যেতে পারে না। চিন্তিত কুসুম, প্রভা তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। ঘটনা পরম্পরায় এরপর গল্পকথকের কলকাতার বাসা উঠে যায়। সবাই দেশের বাড়ি চলে যায়। কুসুমের সঙ্গে বাল্যের এই যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের বিশেষত্ব এটাই পরিণতিতে এক আশ্চর্য সমাপন ঘটান। ‘হিঙের কচুরি’ গল্পটিও এর ব্যতিক্রম নয়। ঘটনার পরম্পরায় এরপর বালক গল্পকারের তিরিশ বছর অতিক্রান্ত হয়। কলকাতায় মেসবাড়িতে থেকে আপিসের কেরণীগিরি করে। ওখানেই সে কলেজ আমলের বন্ধু শ্রীপতির সঙ্গে নানা অভিজ্ঞতার কাহিনি ভাগ করে। শ্রীপতির সঙ্গে কথোপকথনে বারবনিতাদের প্রসঙ্গ আসে এবং গল্পকার বন্ধুকে জানায় - বারবনিতাদের সে যথেষ্ট শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতেই দেখে—

“আমি কিন্তু ওদের অন্য চোখে দেখি। ওদের আমি খুব চিনি। ওদের ঘরে এক সময়ে আমার যথেষ্ট যাতায়াত ছিল।”^৬

এরপর বন্ধু শ্রীপতির অবিশ্বাসী মনকে বিশ্বাসবোধে তৃপ্ত করার জন্য তিরিশ বছর পর গল্পকথক আবার নন্দরাম সেনের গলির দিকে পা বাড়ান। সেখানে পুরানো কাউকেই খুঁজে না পাওয়া গলেও ‘শনের নুড়ি চুল মাথায়, যকথি বুড়ির মতো চেহারার দন্তবিহীন মাড়ির মাখনকে গল্পকথক চিনতে পারে। তার কাছ থেকেই সে কুসুমের সন্ধান পায়। যে এখন শোভাবাজার স্ট্রীটে একটা মেস বাড়িতে বি গিরির কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কুসুমের সঙ্গে তারপর গল্প কথকের দেখা হয়। বাল্যদিনের কুসুমের শ্রী বলতে গেলে সবটাই গেছে। গল্পকথকের কথায়—

“ওর মুখ আমার মনে ছিল, সে মুখের সঙ্গে এ বৃদ্ধার মুখের কিছুই মিল নেই।”^৭

এরপর কুসুমের সঙ্গে আলাপে গল্পকথক নিজের পরিচয় দেন। কুসুম তার হারিয়ে যাওয়া বাল্য ভালোবাসার ভাইটিকে চিনতে পারে। পরিশেষে কথায় কথায় তাকে পাশের গলি থেকে শালপাতার ঠোঙায় ‘হিঙের কচুরি’ এনে দুজনকে খেতে দেয়। এই ‘হিঙের কচুরি’ পুনরায় যেন গল্পকথকের গত তিরিশ বছরকে নিমেষে সরিয়ে দেয়। সে কল্পনা করে—

“কচুরি খেতে খেতে আমার মন সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের ধূসর ব্যবধানের ওপারে আমাকে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে একেবারে নন্দরাম সেনের গলির সেই অধুনালুপ্ত গুড়ের আড়তটা ও রাস্তার কলটার সামনে,

যেখানে কুসুম আজও পঁচিশ বছরের যুবতী, যেখানে তার বাবু আজও সন্ধ্যাবেলায় ঠোঙা হাতে হিঙের কচুরি নিয়ে আসে নিয়মমতো।”^৮

গল্পটির শেষে আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো স্নেহ-ভালোবাসা ও সহানুভূতির ত্রিবেণী সঙ্গম কিভাবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হিঙের কচুরি’ গল্পে লক্ষিত হয়েছে।

১. বিভূতিভূষণ জীবন দরদী শিল্পী কথাসাহিত্যিক ছিলেন। তাই বারবনিতা কুসুম তাঁর এই গল্পে অপূর্ব মমতা ও স্নেহ ভালোবাসায় ভরপুর একজন মা। তাই ব্রাহ্মণ গল্পকথকের পরিণত বয়সেও কুসুমের প্রতি অপারিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অটুট রয়েছে।

২. বারবনিতা রূপে বিভূতিভূষণ শুধু কুসুমের ভ্রাতৃস্নেহ এখানে দেখাননি পাশাপাশি প্রভা, মাখন প্রমুখ নারীচরিত্রগুলিকেও অপূর্ব মমতায় চিত্রিত করেছেন। বারবনিতাবৃত্তিতে তাদের নিয়োজিত হতে হয়েছে বাধ্যবাধকতার জীবন জীবিকার তাড়নায়। কিন্তু তাদের অন্তঃকরণে যে ‘মা’ কিংবা ‘দিদি’ লুকিয়ে রয়েছে সেই দিকটি গল্পকার অস্বীকার করতে পারেন নি। এখানেই স্নেহ-ভালোবাসা-সহানুভূতির মেলবন্ধন অটুট থেকেছে।

৩. সমালোচকের কথায়—

“ভবঘুরে এক পথিক সত্তা হয়েও সাধারণ মানুষের ঘরোয়া জীবনের মায়া-মমতায় জড়ানো রূপের প্রতি বিভূতিভূষণ কোনওদিনই উদাসীন নন, বরং পরম আগ্রহী। তাঁর সেই মমত্ববোধ গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের পরস্পরের প্রতি স্নেহ বা বাৎস্যল্যের ঐকান্তিকতার মধ্য দিয়ে অপরূপ রস-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে।”^৯

‘হিঙের কচুরি’ গল্প তাই মাতৃস্নেহই কুসুমের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। মায়ের মতো সন্তানকে আগলে রাখার যে কর্তব্য তা কোথাও যেন আমাদের জীবন-জীবিকার উর্দ্ধে যে মানবতা স্নেহ ভালোবাসাই, সবসময় জয়ী হয় তাই অপূর্ব মমতায় বিভূতিভূষণ ‘হিঙের কচুরি’ গল্পে তুলে ধরেছেন।

৪. একটি সাধারণ ভোজনপ্রিয় গরীব বালকের রসনাতৃপ্ততা নিয়ে যে একটি গল্প হতে পারে তা বিভূতিভূষণ বলেই সম্ভব। বিভূতিভূষণ অতি সামান্য বিষয়, তুচ্ছাতুচ্ছ জীবনের জলছবিও যে কি নিপুণ মমতায় আঁকতে পারেন তা তাঁর উপন্যাস কিংবা ছোটগল্প পাঠ করলেই আমরা বুঝতে পারবো। সমালোচকের কথায়—

“শুধু গ্রাম্য পরিবেশই নয়, নগরজীবনের পটভূমিতেও বিভূতিভূষণ এই সব নগণ্য অবহেলিত মানুষের গল্প বলেছেন। বলাবাহুল্য, নগরের চেয়ে গ্রামের প্রতিই বিভূতিভূষণের আকর্ষণ বেশি, তবুও কর্মসূত্রে কলকাতা ও অন্যান্য শহরে তাঁকে দীর্ঘদিন থাকতে হয়েছে, যাওয়া-আসা করতে হয়েছে। এরই মধ্যে দিয়ে নগর-জীবনের অভিজ্ঞতার আধারটি তাঁর ভরে উঠেছে একটু একটু করে। কিন্তু সে পাত্রে নগরের আলোকিত ঐশ্বর্যের চোখ ঝলসানো ছবি স্থান পায়নি, সেখানকার জটিল জীবনযাত্রার কিংবা মানসিকতার পরিচয়ও সেখানে মেলেনা— বস্তুত নাগরিকতার প্রতি বিভূতিভূষণের কোনওদিন কোনও মোহ ছিল না, তাঁর শিল্পীমনের অমৃতভাণ্ড ভরে গিয়েছিল শহরের বিড়ম্বিত যন্ত্রণাক্লিষ্ট দরিদ্র মানুষের প্রতি নিবিড় মমতায়।”^{১০}

নগরজীবনের সাধারণ বারবনিতাদের স্নেহ-ভালোবাসা মানবিকতাও যে স্বর্গের উদ্যান তৈরি করতে পারে কিংবা ত্রিবেণী সঙ্গমের স্রোত আমাদের ভালোবাসার সমাজকে স্নিগ্ধ করে ‘হিঙের কচুরি’ গল্পের মধ্যে আমরা তার সার্থক রূপায়ন হতে দেখি।

৫. স্নেহ-ভালোবাসা-সহানুভূতি আমাদের জীবনের সঙ্গে এক চিরন্তন অনুভূতি সঞ্জাত সুখ দেয়। বিভূতিভূষণ তাঁর সামগ্রিক রচনাকর্মে স্নেহ ভালোবাসা-সহানুভূতিকে সবসময় প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন; মর্যাদা দিয়েছেন। এই গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়। আসলে কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ তাঁর ছোটগল্প কিংবা উপন্যাসের মধ্যে জীবনের সহজ সরল আবেদন, সূক্ষ্ম মমত্ববোধ, সহানুভূতি, মানবিকতা, সামান্য বস্তুর মধ্যে অসামান্য আনন্দ সুখ উপভোগটিকেই অনেক বড় করে দেখিয়েছেন। তাই আলোচ্য গল্পটিতে গল্পকথক তাঁর বাল্যের স্মৃতি ‘কুসুম’কে নিয়ে যেমন ছিল তিরিশ বছর পরেও পরিণত বয়সেও সেই একই মমতা-স্নেহ-ভালোবাসায় বিশ্বাসী থেকেছে। কুসুমের পরিচয় সে ভিন্ন জাতের, তার

পতিতাবৃত্তিকে কখনোই নীচ বা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেনি। তাই গল্পের অন্তিমে বৃদ্ধা কুসুমের সঙ্গে সাক্ষাতে তার সচেষ্টিতা, কুসুমের আনিত হিঙের কচুরি অপূর্ব মমতায় রসনাতৃপ্তিতে তার দেহ মন অপূর্ব স্নেহ প্রীতিতে ভরে গেছে। এখানেই ‘হিঙের কচুরী’ গল্পটি সার্থক হয়েছে।

বিভূতিভূষণ তাঁর সৃষ্টিকর্মে সর্বদাই মানুষের জয়গান গেয়েছেন। সবার উপরে মানুষ সত্য এই বিশ্বাসে সর্বদা তিনি সচেষ্টি ছিলেন। তাই সমাজের বঞ্চিত দরিদ্র, ব্রাত্য মানুষদের কথাই তার রচনায় আমরা বারেবারে আবর্তিত হতে দেখি। তাই সমালোচকের কথায়—

“যে সানুরাগ দৃষ্টি দিয়ে বিভূতিভূষণ বনপ্রকৃতিকে দেখেছেন সেই দৃষ্টি দিয়েই মানুষকে দেখেছেন বলেই সব উপেক্ষিত মানুষের মধ্যে তিনি বিচিত্র অথচ পরিচিত জীবনস্বাদ পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন।”^{১১}

‘হিঙের কচুরি’ গল্পে আমরা বারবণিতা কুসুমের গল্প কথকের প্রতি মাতৃস্নেহের যে অতুল্য ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় মানুষের জাত বড় নয়, ধর্ম বড় নয়, জীবিকা বড় নয় ভালোবাসাই সবসময় বড় হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসাই অক্ষয় অমর হয়ে দাঁড়ায়। এখানেই ‘হিঙের কচুরি’ গল্পটি এক অপূর্ব স্নেহ-ভালোবাসা-সহানুভূতির ত্রিবেণী সঙ্গম হয়ে দাঁড়ায়।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *গল্পসমগ্র*, এস.বি.এস. পাবলিকেশন, পুনর্মুদ্রণ বইমেলা, ১৪২২, পৃ. ১৯৫
২. তদেব, পৃ. ১৯৫
৩. তদেব, পৃ. ১৯৭
৪. তদেব, পৃ. ২০১
৫. তদেব, পৃ. ২০২
৬. তদেব, পৃ. ২০৪
৭. তদেব, পৃ. ২০৫
৮. তদেব, পৃ. ২০৫
৯. রায় চৌধুরী, গোপিকানাথ, বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ১১১
১০. তদেব, পৃ. ১০৯
১১. ঘোষ, তারকনাথ, জীবনের পাঁচালীকার বিভূতিভূষণ, আনন্দধারা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৭৬, পৃ. ১১৯